গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ১৪ সংখ্যা | ১৮ - ২৪ নভেম্বর ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

জন্মশতবর্ষে
কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

“আমরা কমিউনিস্টরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের দশ গজের মধ্যে যখন এসে পৌঁছে গিয়েছিলাম, এমন সময় আমাদের কানামাছিতে পেয়ে গেল। নানা মিথ্যাচার, নানা তত্ত্বগত বিভ্রান্তির ফলে আমরা আবার অনেক মাইল দূরে পিছিয়ে চলেছি। এটা ঘটতে পারল কমিউনিস্ট আন্দোলনে আদর্শগত সংগ্রামের দুর্বলতা এবং চেতনার অনুন্নত মানের জন্য।

তাই শুধু লড়াই, শুধু স্লোগান এবং যে কোনও উপায়ে দলের শক্তিবৃদ্ধির কথাই যাঁরা ভাবেন, তাদের আমি একটা কথা ভেবে দেখতে বলি। আমাদের দেশেও কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী তথাকথিত দলগুলির মধ্যে এই মানসিকতা আছে এবং সতর্ক না থাকলে আমাদেরও এই মানসিকতা যে কোনওদিন ছেয়ে ফেলতে পারে। শক্তিবৃদ্ধি হলে তাঁরা আর চোখে-কানে পথ দেখতে পান না। তাঁদের

দুয়ের পাতায় দেখুন

তথাকথিত সংরক্ষণে জনগণের মধ্যে বিভেদই বাড়বে

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৯ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চ ৭ নভেম্বর সংবিধানের ১০৩তম সংশোধনীকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিয়ে আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের যে রায় দিয়েছে, তা চরম হতাশাজনক। এর মধ্যে আমাদের দেশের কোটি কোটি শোষিত মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতার মনোভাব তৈরি করার সম্ভাবনার বীজ মজুত আছে।

স্মরণ করা দরকার, এক গভীর সামাজিক সাংস্কৃতিক সমস্যাকে সমাধানের কথা বলে এসসি-এসটিদের জন্য শিক্ষা ও চাকরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। চরম দুর্দশাগ্রস্ত দলিত, আদিবাসী এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ শত শত বছর ধরে তথাকথিত উচ্চবর্ণ ও ধনীদের অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে, ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারাও তারা একইরকম ভাবে অবহেলিত হয়েছে। এই অংশের মানুষ যাতে আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক পশ্চাদপদতা ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত হতে পারে, সমাজের সর্বস্তরে যাতে তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকে সে ব্যাপারে তাদের সাহায্য করার কথা বলেই চালু হয়েছিল সংরক্ষণের নীতি। সেই সময় বলা হয়েছিল, এই সংরক্ষণ ১০ বছরের জন্য চালু থাকবে এবং তারপর পর্যালোচনা করে দেখা হবে, সীমিত সময়ের এই সংরক্ষণ তার লক্ষ্যপূরণে কতদূর সমর্থ হয়েছে।

এই লক্ষ্যপূরণের জন্য এই সমস্ত সম্প্রদায়ের উপর ঐতিহাসিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া সামাজিক বিভেদ ও বঞ্চনা দূর করতে সরকারের পক্ষ থেকে নিরলস প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাস্তবে স্বাধীন ভারতে একচেটিয়া পুঁজির সেবাদাস সরকারগুলি এই সমস্ত মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য কিছুই করেনি। বরং সকলের জন্য শিক্ষা এবং চাকরির ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ এই সরকারগুলি শোষিত মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে ও এক অংশের দরিদ্র মানুষকে অপর অংশের দরিদ্র মানুষের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়ার কৌশল হিসাবে এই সংরক্ষণ নীতিকে ব্যবহার করেছে। যে উদ্দেশ্যের কথা বলে সংরক্ষণ নীতি চালু হয়েছিল, তা আজও পর্যন্ত অর্জিত হয়নি শুধু নয়, সময়ের সাথে সাথে অন্যান্য অংশের নিপীড়িত জনগণের মতোই এই অংশের পিছিয়ে পড়া, সুযোগ বঞ্চিত মানুষদের, প্রধানত এসসি-এসটি সম্প্রদায়ভুক্তদের পরিস্থিতি ক্রমাগত খারাপ থেকে আরও বেশি খারাপের দিকে গেছে।

উদারিকরণ ও বেসরকারিকরণের এই যুগে সব বুর্জোয়া সরকারই সমাজকল্যাণমূলক সমস্ত প্রকল্প থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে, শিক্ষাকে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের হাতে তুলে দিচ্ছে। শিল্পে ছাঁটাই বা ডাউন সাইজিং এখন সরকারি রীতিতেই পর্যবসিত হয়েছে।

দুয়ের পাতায় দেখুন

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমিকবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এআইইউটিইউসি-র ডাকে ১৪ নভেম্বর
মহানগরীর রাস্তায় মিছিলের ঢেউ

শ্রমজীবী মানুষের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি অবিলম্বে সমাধানের দাবিতে ১৪ নভেম্বর শ্রমিক বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল এ আই ইউ টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। সমস্ত জেলা থেকে বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী মানুষ এই বিক্ষোভে যোগ দেন। চা, বিড়ি, পরিবহণ শ্রমিক, সংগঠিত শিল্প ও সরকারি কর্মচারী, বাইক ট্যাক্সি চালক, স্কিম ওয়ার্কার, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে ঠিকা শ্রমিক সহ নানা পেশার শ্রমিক কর্মচারীরা কলেজ স্কোয়ার থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত এই মিছিলে সামিল হন। **বিস্তারিত চারের পাতায়**

সাম্প্রদায়িকতা, বেসরকারিকরণ, উন্নয়নের নামে প্রতারণা, সীমাহীন দুর্নীতি রোধ সহ জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে ও সংগ্রামী বামপন্থার ঝান্ডাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে

গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থী

১। কমরেড মীনাক্ষী জোশি	আমেদাবাদের এলিসব্রিজ কেন্দ্র
২। কমরেড ভারতী পারমার	ভদোদরার আকোটা কেন্দ্র
৩। কমরেড রাম মুরত মৌর্য	সুরাটের লিম্বায়েৎ কেন্দ্র

সরকারি মদের দোকান ঃ যুব বিক্ষোভ

গোটা রাজ্য জুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজির মাধ্যমে মদের দোকান খোলার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এআইডিওয়াইও-র নেতৃত্বে ১১ নভেম্বর বীরভূমের মুরারই রেলগেট থেকে বাজার পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল হয়। রেলগেট অবরোধ করে কালা সার্কুলারের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। কলকাতায় ১২ নভেম্বর ওয়েলিংটন মোড়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ। রাজ্য সম্পাদক কমরেড মলয় পাল বলেন, রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ সরকারের এই 'দুয়ারে মদ' প্রকল্পের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও সরকার যেভাবে নিজস্ব মদের দোকান ফ্র্যাঞ্চাইজি দিয়ে খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা অত্যন্ত অনৈতিক ও সমাজে সর্বনাশ ডেকে আনবে। এই সিদ্ধান্তপ্রত্যাহারের দাবিতে দলমত নির্বিশেষে এলাকায় এলাকায় মদবিরোধী কমিটি তৈরি করে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

সংরক্ষণ

একের পাতার পর

এর ফলে সরকারি শিক্ষা ও সরকারি চাকরির সুযোগ প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছে। সমস্ত বুর্জোয়া সরকারগুলি শূন্যপদ বিলোপের নীতি নিয়ে চলার ফলে চাকরির সুযোগ সামগ্রিক ভাবেই ব্যাপক হারে কমছে। এই অবস্থায় এই তথাকথিত সংরক্ষণ কার্যত মানুষের সাথে প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। নির্বাচনসর্বস্ব, গদিলোভী বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির হাতে এটা ভোটব্যাঙ্ক তৈরির একটা হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে এবং মিথ্যা আশার গাজর ঝুলিয়ে এক অংশের সাধারণ মানুষকে অন্যের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার হীন কাজে তারা এটাকে ব্যবহার করতে পারবে।

দুঃখের বিষয় হল, ৭৫ বছর ধরে পুঁজিবাদের নির্মম শোষণের ফলে ধনী আরও ধনী হচ্ছে, গরিব আরও গরিব হয়ে চলেছে। এটা অত্যন্ত কঠিন সত্য যে, এতদিন সংরক্ষণ থাকা সত্ত্বেও এই বৈষম্য আরও প্রকট হয়েছে এবং সমাজে একদল সুবিধাভোগী তৈরি হয়েছে যারা সংরক্ষণের সুবিধা সবটুকু ভোগ করছে। বাস্তব হল, নতুন সংরক্ষণ নীতির ফলেও গরিবদের সামান্য অংশই উপকৃত হবে এবং বেশিরভাগ অংশ দরিদ্রই থেকে যাবে।

এই পরিস্থিতিতে এটা পরিষ্কার যে, অসংরক্ষিত শ্রেণিগুলির আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের মানুষের জন্য এই তথাকথিত সংরক্ষণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। এটা আসলে একটা বিরাট ভাঁওতা। একমাত্র শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিভেদ ফেনিয়ে তোলা, সংঘর্ষ বাধানো ছাড়া এই চতুর পদক্ষেপ আর কোনও উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না। আমরা দেশের মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, শাসক শ্রেণির এই পদক্ষেপের আসল উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করে শোষিত মানুষের ঐক্য শক্তিশালী করুন এবং চাকরির ন্যায্য দাবিতে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলুন। মানুষের ন্যায্য দাবি আদায়ে বুর্জোয়া সরকারকে বাধ্য করার এটাই একমাত্র রাস্তা।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

একের পাতার পর

মাথা ঠিক থাকে না। তাঁরা আদর্শের দিক থেকে কতদূর এগোচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে তত্ত্বগত চেতনার মান বাড়ছে কি না, যেসব কর্মীরা তাঁদের দল ভারী করছে সেইসব কর্মীরা সঠিক কমিউনিস্ট চেতনায় উদ্বুদ্ধ কি না, তাদের মধ্যে উন্নত কমিউনিস্ট নৈতিকতার ভিত্তি আছে কি না, আদর্শবাদ আছে কি না, নাকি তারা শুধু স্লোগানসর্বস্ব কর্মী, শুধু দলের শক্তিবৃদ্ধি করছে, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি তাঁরা কোনও নজর দেন না। শক্তিবৃদ্ধির নামে যারা এসে তাদের দলে ভিড় করে, দলের সভ্য হিসাবে তাদের পরিচয়টা জানা না থাকলে রাস্তার একটা রকবাজ ছেলের সঙ্গে কোনও পার্থক্যই তাদের খুঁজে বের করা যাবে না। এইভাবে দল ভারি করলে দলের কর্মী সংখ্যা হয়তো তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়, পার্লামেন্টারি রাজনীতির আসরও হয়তো গরম হয় এবং তাদের নেতা হওয়ার বা প্রচার-প্রোপাগান্ডার ক্ষেত্রে হয়তো অনেক সুবিধা হয়, কিন্তু তার ফলে বিপ্লবের গোটা মানসিকতাটাই মার খায়। কারণ, সাধারণ মানুষ, যারা কমিউনিজম এবং কমিউনিজমের ভাবাদর্শকে বুঝতেও চায়, তারা ঐ নিচু স্তরের কর্মীদের আচার-ব্যবহার দেখে সেই কমিউনিজম সম্পর্কেই বিগড়ে যায়। প্রতিদিন এদের সঙ্গে মেলামেশার দ্বারা তারা দেখে, যারা কমিউনিজমের কথা বলছে, পাড়ার অন্যান্য রকবাজ ছেলেদের সাথে তাদের কোনও পার্থক্য নেই। জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, নীতিনৈতিকতা, সমস্ত দিক থেকে তারা ঐ রকবাজ ছেলেদের মতোই। যদি না জানা থাকে যে, এই ছেলেটা কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার, তা হলে অন্যদের থেকে আলাদা করে তাকে চেনবারই উপায় নেই। সেজন্যই বিপ্লবীদের উন্নত আদর্শগত ও নৈতিক মান অর্জনের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

'নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি' পুস্তক থেকে

টেট আন্দোলনকারীদের পাশে বাইক-ট্যাক্সি চালকরা

কলকাতার ধর্মতলায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশে আন্দোলনরত নবম-দ্বাদশের শিক্ষক পদপ্রার্থীদের যে ধরনা চলছে, ১০ নভেম্বর তার ৬০৬তম দিনে কলকাতা সাবারবান বাইক ট্যাক্সি অপারেটর্স ইউনিয়ন-এর পক্ষ থেকে সেখানে গিয়ে তাঁদের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করা হয়। সভাপতি শান্তি ঘোষ ও সম্পাদক দেবু সাউ সহ অন্যান্য প্রতিনিধিরা আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থীদের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দেন। যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন জারি রাখার আহ্বান জানান সভাপতি।

জীবনাবসান

দলের উত্তর পুরুলিয়া সাংগঠনিক জেলার সাঁওতালডি-২ লোকালের প্রবীণ পার্টিকর্মী কমরেড আকুল কুম্ভকার বার্ধক্যজনিত কারণে দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৬ সেপ্টেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে দলের আদর্শের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং নিজেকে একজন একনিষ্ঠ কর্মীতে পরিণত করেন।

১৯৭১ সালে এলাকার বিসিসিএল-এর রোপওয়েজ ডিভিশনে ট্রেড ইউনিয়নের বিভিন্ন আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি ইউনিয়নে যোগ দেন এবং সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিজেকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করেন। আশেপাশের গ্রামে এসইউসিআই(সি)-র সংগঠন গড়ে তোলার কাজে সক্রিয় ভূমিকা নেন। ওই সময়ে মালিকদের পোষা দুষ্কৃতী বাহিনীর হুমকি উপেক্ষা করে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাওয়া কঠিন ছিল। কিন্তু তিনি পিছপা হননি। এলাকায় সংগঠন গড়ার কাজে যতদূর সম্ভব সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি আন্দোলন করতে গিয়ে পরিবারের উপর আক্রমণ হলে, তিনি যথার্থ অভিভাবকের মতো আক্রমণ মোকাবিলা করার সাহস জুগিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত শারীরিক ক্ষমতা ছিল এলাকার গরিব মানুষের স্বার্থে লড়াই করে গেছেন। কমরেডদের প্রতি তাঁর ছিল অফুরন্ত ভালোবাসা। দলের সকলের জন্য তাঁর ঘর ছিল অবারিত।

৮ নভেম্বর সাঁওতালডিতে তাঁর স্মরণসভায় কর্মী সমর্থক দরদি থেকে শুরু করে এলাকার বহু মানুষ অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে অংশ নেন। বক্তব্য রাখেন দলের জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড ডি কে মুখার্জী। উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মদন চ্যাটার্জী।

কমরেড আকুল কুম্ভকার লাল সেলাম

কলকাতা জেলার দমদম লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড অরুণ বোস ২১ সেপ্টেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। ১৯৬২ সালে দমদম অঞ্চলে দলের মাত্র কয়েকজন কর্মীর উদ্যোগে বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষ উদযাপন হয়। কিশোর বয়সে কমরেড অরুণ বোস তাতে অংশগ্রহণ করেন। তখন থেকেই তিনি দলের নেতা কর্মীদের সঙ্গে মেলামেশার মধ্য দিয়ে ছাত্রাবস্থায় এআইডিএসও-র সাথে যুক্ত হন। পরে তিনি দমদমে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় সুপারভাইজারের পদে চাকরি করলেও সব সময় শ্রমিকদের পাশে থাকার চেষ্টা করতেন। সেই কারণে কারখানার মালিকপক্ষ তাঁকে ছাঁটাই করে। সেই সময় তিনি দলের পলিটবুরো সদস্য, শ্রমিক নেতা কমরেড শঙ্কর সাহার সংস্পর্শে আসেন ও নিজেকে ধীরে ধীরে উন্নতমানের কর্মী হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। অসুস্থতার মধ্যেও এলাকায় মানুষের মধ্যে দলের কথা নিয়ে যেতেন। দলের কর্মীদের পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন। তাঁর মরদেহ এলাকায় এলে সাধারণ মানুষ, কর্মী, সমর্থকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। দমদম লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে মরদেহে মাল্যদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

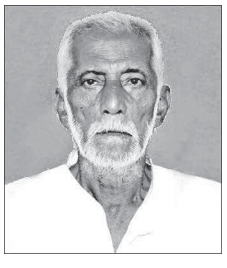

১৬ অক্টোবর বাপুজি কলোনি বুনিয়াদি বিদ্যামন্দিরে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের জেলা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখা হয়। এলাকার পৌর প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন।

কমরেড অরুণ বোস লাল সেলাম

সমাজতন্ত্রই দিয়েছিল উন্নত নাগরিক জীবন

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী তথা কমিউনিস্ট বিদ্বেষীদের প্রচার শুনলে মনে হবে, যেন সমাজতান্ত্রিক রুশ জনগণ দাসসুলভ জীবন যাপন করত, নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বলতে কিছু ছিল না, যার যা কিছু ব্যক্তিগত সম্পদ ছিল, রাষ্ট্র সব কেড়ে নিয়েছিল, ভোগ্যপণ্য ও আধুনিক জীবন থেকে বঞ্চিত মানুষ যেন এক আদিম স্তরে ছিল। সমাজতন্ত্র বিরোধী সাম্রাজ্যবাদীরা পরিকল্পিত এমন অজস্র ডাহা মিথ্যা প্রচার করত যাতে সেই সব দেশের মানুষ উন্নত সোভিয়েত জীবন সম্পর্কে আগ্রী না হয়ে ওঠে।

এরই জবাব দিতে রাশিয়ার মানুষ পাভেল ক্রাসনভ নতুন উপায় বের করেন। সমাজতন্ত্রের সময় বিভিন্ন ব্যক্তি ও পরিবার নানা ঘটনা ও দৃশ্যের যেসব ছবি তুলে পরিবারের অ্যালবামে রেখেছিল, মিঃ ক্রাসনভ সেগুলি সংগ্রহ করেন। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত নর্থস্টার কম্পাস পত্রিকা ২০০৯ সালের জুলাই সংখ্যা থেকে ওই ছবিগুলি পরপর তিনটি সংখ্যায় মন্তব্য সহ প্রকাশ করে। ১৯৩০-৫০ সালের মাঝখানের সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সাধারণ পরিবারের দিন যাপনের একটা চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। ফটোগুলিতে মানুষের চোখমুখের ছবি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ যে চিত্র তুলে ধরেছে তা যে কোনও বক্তার চেয়ে বাঙ্ময় হয়ে সত্যকে প্রকাশ করে। দুশ্চিন্তামুক্ত সেই জীবন আজ গল্পকথা। পুঁজিবাদ দুনিয়ার কোথাও তা দিতে পারেনি। প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তে সমাজতন্ত্র ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে রাশিয়ার মানুষও তা হারিয়েছেন।

ব্রিটিশ ও মার্কিন প্রচারমাধ্যম দেখায় তারা স্বাস্থ্যবীমার মাধ্যমে নাগরিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে। কিন্তু যেটা তারা বলে না তা হল, স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়াম সাধারণ মানুষকেই জোগাতে হয়। স্বাস্থ্যবিমা সে দেশের গরিব মানুষের বেশিরভাগের নাগালের বাইরে। বর্তমানে একচেটিয়া পুঁজির প্রবল দাপটের মাঝে স্বাস্থ্যবিমার প্রতারণা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা মাইকেল মুরের তোলা 'সিকো' সিনেমাটা দেখলে বোঝা যাবে। এর বিপরীতে, প্রথমে লেনিনের নেতৃত্বে ও তার পরে স্ট্যালিনের পরিচালনায় সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল দুনিয়ার প্রথম ও একমাত্র রাষ্ট্র যে ঘোষণা করেছিল নাগরিকদের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও জীবিকার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। আজও আমেরিকার মতো ধনী দেশ তা পারেনি শুধু নয়, করোনা অতিমারিতে লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষের মৃত্যু দেখিয়ে দিয়েছে সেখানকার জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা কতখানি ঠুনকো। কিন্তু রাশিয়া পেরেছিল।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় সকলের জন্য শিক্ষা মানে পুঁজিবাদী দেশগুলি যেমন অক্ষর পরিচয়ের ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে, তেমন সমাজতন্ত্রে শিক্ষা কোনও মতে সই করতে শেখা নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'পাকারকম শিক্ষা', মানুষকে দেশ গড়ার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার শিক্ষা। সে শিক্ষা ছিল পুরোপুরি অবৈতনিক, তাই তা ছিল সকলের নাগালের মধ্যে। যার ফলে বিপুল মানবসম্পদে সমৃদ্ধ সোভিয়েট সমাজতন্ত্র মাত্র দশ বছরের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে উন্নত দুনিয়াকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পূজারিরা বলে থাকেন, স্ট্যালিন যাদের ধরে ধরে জেলে পুরেছিলেন, সোভিয়েট ইউনিয়নে সেই রাজনৈতিক বন্দিদের বেগার শ্রম দিয়ে নাকি শিল্পায়ন করা হয়েছিল। বাস্তবে সোভিয়েট ইউনিয়নে ফ্যাসিস্ট দোসরদের গ্রেপ্তার ও বিচারের আগেই, ১৯৩৭ সালেই শিল্পায়নের কাজ শেষ হয়ে যায়, যার কিছুদিন বাদেই শুরু হয় যুদ্ধ। শিল্পায়নের কাজে রাজনৈতিক বন্দিদের অবদান মাত্র ১ শতাংশ— বলেছেন পাভেল ক্রাসনভ।

সমাজতন্ত্রবিরোধীরা বলে থাকে, রাশিয়ায় সকল মানুষের সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তা যে সত্য নয়, ক্রাসনভ তা দেখিয়েছেন। এই শিল্পায়নের বিন্দুমাত্র বেসরকারি উদ্যোগে হয়নি, হয়েছিল সরাসরি রাষ্ট্রের উদ্যোগে। কিন্তু সেজন্য সকল ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তা সত্য নয়। বেসরকারি উদ্যোগ বলতে এখন দেখা যায় সরকারি মদতে বেসরকারি পুঁজির অবাধ লুণ্ঠন, সরকারি সম্পত্তি জলের দরে কিনে তা থেকে মুনাফা করা। সোভিয়েট ইউনিয়নের কো-অপারেটিভ ছিল ঠিক তার উল্টো। কো-অপারেটিভে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল, কিন্তু তা ছিল সামাজিক মালিকানায় পৌঁছানোর পথে একটা অনিবার্য ধাপ। কো-অপারেটিভ খামার থেকে যৌথ খামার ও শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় খামারে পৌঁছানো ছিল সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রাষ্ট্রের উদ্যোগে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে দেশব্যাপী কো-অপারেটিভ আন্দোলন পরিচালিত হয়। ১,৪০,০০০ শিল্প গড়ে ওঠে যাতে কর্মসংস্থান হয়েছিল ২০ লক্ষেরও বেশি লোকের। ১৯৩০ সালে কো-অপারেটিভ খামারে কাজ করতেন কমপক্ষে ৩ কোটি মানুষ। ১৯২০ সালে দেশের ৮০-৯০ শতাংশ লোক বাস করত গ্রামে ও ছোট ছোট গঞ্জে, ১৯৭০ সালের মধ্যে শহরের জনসংখ্যা ৬০ শতাংশ বেড়ে যায়। শহরাঞ্চলে গড় দৈনিক মজুরি যা ছিল তা দিয়ে ১০০০ কিলো আলু বা ৩২ লিটার দুধ কেনা যেত। সমাজতন্ত্র ধ্বংসের সাথে সাথে এ-সবই এখন ইতিহাস হয়ে গেছে।

পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদীরা বলেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল দাস তৈরির কারখানা। সেখানে মানুষ নয়, তৈরি করা হত নেতাদের অন্ধ ভক্ত কিছু ব্যক্তিকে। ক্রাসনভ লিখেছেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল একমাত্র দেশ যেখানে শ্রমিকদের শোনার জন্য ধ্রুপদী সংগীত পরিবেশন করা হত। যারা রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' পড়েছেন, তাঁরা ক্রাসনভের বক্তব্যের সত্যতা জানেন। ত্রিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ মস্কো থেকে লিখেছেন "আমি যেদিন অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম সেদিন হচ্ছিল টলস্টয়ের রেজারেকশন। জিনিসটা জনসাধারণের পক্ষে সহজে উপভোগ্য বলে মনে করা যায় না, কিন্তু শ্রোতারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে শুনছিল। অ্যাংলো-স্যাকসন চাষি-মজুর শ্রেণির লোক এ জিনিস রাত্রি একটা পর্যন্ত এমন স্তব্ধ শান্তভাবে উপভোগ করছে এ কথা মনে করা যায় না, আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দাও।

আর একটা উদাহরণ দিই। মস্কো শহরে আমার ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। ... লোকের ঠেলাঠেলি ভিড়। আর যে যা বলে বলুক, অন্তত আমি তো এদের রুচির প্রশংসা না করে থাকতে পারব না।"

এর পরেই পাশ্চাত্যের সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— "যে-সব দেশে অর্থ এবং শক্তির অধ্যবসায় ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা বিভক্ত সেখানে এরকম চিত্তের নিবিড় ঐক্য অসম্ভব।"

সমাজতন্ত্রের প্রশংসা করে তিনি লিখেছেন— "...অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতমতল থেকে আজ কেবল মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায়নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে ... অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম কি শুধু পুঁথির মন্ত্রে?"

সোভিয়েটের কিশোররা গরমকালে যেত পাইওনিয়ার ক্যাম্পে, সেখানে তারা লেখাপড়া করত, ট্রেনিং পেত, বিনোদনের ব্যবস্থাও ছিল। এর সব খরচই বহন করত রাষ্ট্র, বাবা-মাকে খরচ নিয়ে ভাবতে হত না। ত্রিশের দশকে সোভিয়েট ইউনিয়নে এ ধরনের ক্যাম্প তৈরি হয়েছিল, বিশ্বের কোনও পুঁজিবাদী দেশে এর দ্বিতীয় নজির নেই। এই সময়েই রাশিয়ায় বিমান উড়ান সম্পর্কে বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ চল হয়েছিল, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েটের বিজয়ের পথ করে দিয়েছিল। পার্কে পার্কে গড়ে তোলা হয়েছিল প্যারাসুট টাওয়ার। সোভিয়েট ইউনিয়ন বিশ্বে সর্বপ্রথম এই ধরনের টাওয়ার তৈরি করে। গড়পড়তা ৫০ মিটার উঁচু এই প্যারাসুট টাওয়ার থেকে যুবক-যুবতীরা প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপ দেওয়ার শিক্ষা নেওয়ার সাথে সাথে দৃঢ়চেতা ও সাহসী হয়ে ওঠে। সোভিয়েট ইউনিয়ন গড়তে চেয়েছিল দাস মনোভাব থেকে মুক্ত সাহসী নাগরিক। ১৯৩৫ সালে ৮ লক্ষ সোভিয়েট নাগরিক প্যারাসুট ক্লাবগুলিতে নাম লিখিয়েছিল। স্ট্যালিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই প্যারাসুট টাওয়ার বন্ধ করা শুরু হয়। ক্রুশ্চেভ সংশোধনবাদীরা ক্ষমতায় আসার পর ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সব প্যারাসুট পার্কই বন্ধ করে দেওয়া হয়।

শরীর ও মনের সুশিক্ষার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র নাগরিকদের এমন সুস্থতার অধিকারী করেছিল যে, শিল্পে মানব শরীরের সৌন্দর্য প্রদর্শিত হলেও তা নাগরিক মনে কোনও অশ্লীলতার উদ্রেক করত না। প্রায় প্রত্যেক যুবককে শিক্ষা সমাপনের পর

সাতের পাতায় দেখুন

সংবাদপত্রের পাতা থেকে

আনন্দবাজার পত্রিকা

রুষিয়ার নৈতিক উন্নতি

মিঃ কোটস "ফরেন এফেয়ার" নামক পত্রে আধুনিক রুষিয়া সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, লণ্ডনে আসিবার পর আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "রুষিয়ায় গণিকাবৃত্তি আছে কিনা?" দেখিবার ও শুনিবার সাধারণ ক্ষমতা আছে এরূপ যে কোনও লোক রাত্রি দশটার পর লণ্ডন, প্যারী, ব্রুসেলস, বার্লিন প্রভৃতি সহরের রাস্তায় বাহির হইলেই বুঝিতে পারিবে যে কত হতভাগিনী নারী জীবিকার জন্য গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু রুষিয়ার সম্বন্ধে তাহা বলা যায় না। আমি রুষিয়ার নগর সমূহের রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি বলিতে পারি যে আমি সেখানে গণিকাবৃত্তির চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাই নাই।

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলিকাতা শনিবার
২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৩০
ইং ১০ নবেম্বর, ১৯২৩
২য় বর্ষ ২০২ সংখ্যা

হরিয়ানায় সরকারি মেডিকেল কলেজে ফি বছরে ১০ লাখ, প্রতিবাদ এআইডিএসও-র

সরকারি কলেজে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি ফি ১০ লক্ষ টাকা করেছে হরিয়ানার বিজেপি সরকার। লুঠেরা সরকারের এই সিদ্ধান্তে কঠিন সমস্যায় পড়েছে ডাক্তারি পড়তে চাওয়া গরিব-মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্রছাত্রীরা। এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে ৮ নভেম্বর এআইডিএসও-র নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীরা রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরের গেটে বিক্ষোভ দেখায়। বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ানো হয়। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন ছাত্র নেত্রী ঈশা কাশ্যপ, পিঙ্কি, মীনাক্ষী, মোহিত, প্রফুল, কনওয়ারলাল প্রমুখ।

মহানগরীর রাস্তায় মিছিলের ঢেউ

১৪ নভেম্বর কলকাতার রাজপথ ভেসে গেল হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর প্লাবনে। কেন্দ্রীয় সরকার নতুন শ্রম কোডের মাধ্যমে কেড়ে নিচ্ছে দেশের শ্রমিক-কর্মচারীদের সমস্ত অর্জিত অধিকার, কেড়ে নিচ্ছে সামান্য যেটুকু সামাজিক সুরক্ষা তাঁরা পেতেন— তাও। রেল, ব্যাঙ্ক, বিমা, তেল কোম্পানি, বিমান কোম্পানি থেকে শুরু করে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে কেন্দ্রীয় সরকার বিক্রি করে দিচ্ছে বেসরকারি মালিকদের হাতে। ছাঁটাই হচ্ছেন সংগঠিত ক্ষেত্রের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী। পেনশন, ইএসআই, পিএফের অধিকারটাও কেড়ে নিচ্ছে কেন্দ্র এবং রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন সরকারগুলো। আশা কর্মী, মিড-ডে মিল কর্মী, পৌর স্বাস্থ্যকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মতো স্কিম ওয়ার্কাররা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতিটুকুও পান না। দিনরাত অসংখ্য মানুষকে পরিষেবা দিয়েও সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স পাওয়ার স্বীকৃতি জোটে না মোটরভ্যান শ্রমিকদের। বাইক ট্যাক্সি চালক, কর্পোরেট সংস্থার ডেলিভারি কর্মী, গিগ ওয়ার্কাররা চরম শোষিত। সরকার সব জেনেও ভান করে যেন এদের সমস্যা তারা জানেই পায় না। শ্রমজীবী মানুষের এই সমস্ত জ্বলন্ত সমস্যার অবিলম্বে সমাধানের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছিল এ আই ইউ টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী মানুষ ওই দিন কলকাতার বিক্ষোভে যোগ দেন। উত্তরবঙ্গের চা বাগান শ্রমিক থেকে শুরু করে নানা জেলার বিড়ি শ্রমিক, সংগঠিত শিল্পের কর্মচারী, সরকারি কর্মচারী, পরিবহণ শ্রমিক, বাইক ট্যাক্সি চালক, স্কিম ওয়ার্কার, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে ঠিকা শ্রমিক সহ নানা পেশার শ্রমিক কর্মচারীরা তাঁদের দাবি-প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিলে সামিল হন। মিছিল শুরুর আগে কলেজ স্কোয়ারে বিশাল শ্রমিক জমায়েতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর দাশগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস, সহ সভাপতি কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন, সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা। এ ছাড়াও স্কিম ওয়ার্কার্স সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড ইসমত আরা খাতুন সহ বিভিন্ন ট্রেডের শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলির শ্রমিক বিরোধী ও মালিক তোষণকারী পদক্ষেপগুলি তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ম্যানেজার হিসাবে শ্রমজীবী মানুষকে নিঃশেষে শুষে নেওয়ার জন্য পুঁজিপতিদের হাতে নতুন শ্রমকোড তুলে দিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। কেড়ে নিচ্ছে শ্রমিকদের সমস্ত অধিকার। এই একই লক্ষ্যে দেশের সমস্ত সম্পদ, কলকারখানা, রেল-ব্যাঙ্ক-বিমা-বন্দর তারা মালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে হবে। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস আগামী জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে জেলায় জেলায় ধরনা, বিক্ষোভ মিছিল ও পরবর্তীকালে রাজ্য স্তরে আইন অমান্যের কথা জানান।

কলেজ স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে সুসজ্জিত বিশাল মিছিল শিয়ালদহ, মৌলালি হয়ে এসপ্ল্যানেডে পৌঁছনোর পর কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ৬ জনের প্রতিনিধি দল শ্রমমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়ে ২১ দফা দাবি তুলে ধরেন। রাজ্যপালের কাছে যায় কমরেড গৌরীশঙ্কর দাসের নেতৃত্বে ৪ জনের প্রতিনিধি দল। এছাড়াও স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহণ প্রভৃতি দপ্তরে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

টেট আন্দোলনকারীদের উপর আবার পুলিশি বর্বরতা

ধিক্কার এসইউসিআই (সি)-র

রবীন্দ্র সদন ও ক্যামাক স্ট্রিটে ৯ নভেম্বর টেট পরীক্ষার্থীদের আন্দোলনে পুলিশি বর্বরতাকে ধিক্কার জানিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১০ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, ২০১৪-তে প্রাথমিকে টেট-উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা দীর্ঘ দিন ধরে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন নিয়োগের দাবিতে। আজ তাঁরা যখন রবীন্দ্র সদন ও ক্যামাক স্ট্রিটে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন তখন পুলিশ তাদের উপর আক্রমণ করে। একজন মহিলা বিক্ষোভকারীর হাতে পুলিশ কর্মীর কামড়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। বহু বিক্ষোভকারী বিক্ষোভস্থলেই জ্ঞান হারান। একজনের মাথা ফেটে যায়।

পুলিশের এই আক্রমণকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই। আমাদের দাবি— ১) ২০১৪ ও ২০১৭-র টেট উত্তীর্ণদের পুনরায় পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা চলবে না। ২) ২০১৪-র উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ওই সময়ে ঘোষিত শূন্যপদের ভিত্তিতে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে আগে নিয়োগ করতে হবে। ৩) ২০১৭-র উত্তীর্ণদের ২০১৭ সালে ঘোষিত শূন্যপদের ভিত্তিতে একই প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করতে হবে। ৪) এই দুই নিয়োগ প্রক্রিয়া যতদিন সম্পূর্ণ না হচ্ছে ততদিন ওই প্যানেলের মেয়াদ শেষ করা চলবে না। ৫) নিয়োগ সংক্রান্ত এই জটিলতা কাটাতে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ চাই। তিনি বলেন, আমাদের আরও দাবি, এই নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখার সার্বিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

নিন্দা এআইডিএসও-র

টেট-উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশি নির্যাতনের তীব্র নিন্দা জানিয়ে এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক মণিশংকর পট্টনায়েক ১০ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি চাকরির পরীক্ষায় চূড়ান্ত দুর্নীতির চিত্র উঠে আসার পরেও সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে না। অথচ চাকরির দাবিতে আন্দোলনরত বেকার যুবকদের উপর পুলিশ বারেবারে নির্মম অত্যাচার নামিয়ে আনছে।

পূর্বের সব শাসকের মতোই ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলন দমনে তৃণমূল সরকারের পুলিশের ন্যক্কারজনক ভূমিকার বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রী সহ সর্বস্তরের জনসাধারণকে সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানাচ্ছি এবং আন্দোলনকারীদের পাশে থাকার অঙ্গীকার গ্রহণ করছি।

জেলাশাসককে স্মারকলিপি কৃষকদের

এআইকেকেএমএস এবং কোচবিহার জেলা আলু-পাট-ধান চাষি সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে ৭ নভেম্বর কৃষকদের ৬ দফা দাবি নিয়ে জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন নৃপেন কার্যী, সান্ত্বনা দত্ত, কৃষ্ণ বর্মন, মানিক বর্মন প্রমুখ।

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় সারের কালোবাজারি, প্রধানমন্ত্রী কিসান যোজনার অনুদান না পাওয়া, ঋণগ্রস্ত চাষিদের সঙ্গে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের অমানবিক ব্যবহার ইত্যাদি সমস্যাগুলি উঠে আসে। জেলাশাসক বিষয়গুলি সমাধানে উদ্যোগ নেবেন বলে জানান। এর আগে ৩ নভেম্বর ওই দুই সংগঠন জেলাশাসক দপ্তরে স্মারকলিপি দিতে গেলে প্রতিনিধিদের পুলিশ হেনস্থা করে। প্রতিবাদে কৃষকরা কাছারি মোড় অবরোধ করেন। এরপর জেলাশাসক দপ্তর থেকেই ৭ নভেম্বর সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসার আহ্বান জানানো হয়।

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উদযাপন

৭ নভেম্বর মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৬তম দিবস দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে দেশ জুড়ে উদযাপিত হয়। দলের অফিস, সেন্টার এবং শহর ও গঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মহান লেনিন ও স্ট্যালিনের ছবিতে মাল্যদান, দলের পতাকা উত্তোলন, উদ্ধৃতি প্রদর্শনী, বুক স্টল, ব্যাজ পরিধান, সভা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়।

হরিয়ানার ভিওয়ানি

হরিয়ানার ভিওয়ানিতে দলের জেলা দফতরে মহান রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৫তম বার্ষিকী উদযাপিত হয় ১০ নভেম্বর। রক্তপতাকা উত্তোলন, মহান লেনিন ও স্ট্যালিনের ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে কর্মসূচিটি পালিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রামফল। সভাপতিত্ব করেন দলের জেলা সম্পাদক রাজকুমার জাংড়া।

কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে মহান লেনিন ও মহান স্ট্যালিনের ছবিতে মাল্যদান ও পতাকা উত্তোলন, এসপ্ল্যানেডে লেনিন মূর্তিতে মাল্যদান ছাড়াও আঞ্চলিক কমিটিগুলির উদ্যোগে কর্মসূচি পালিত হয়। কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে ১৭ নভেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল। সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী।

নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার কল্যাণী, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর সহ বিভিন্ন স্থানে বুকস্টল, মহান লেনিনের ছবি সংবলিত ব্যাজ পরিধান, রক্তপতাকা উত্তোলন প্রভৃতি কর্মসূচি পালিত হয়। কৃষ্ণনগর শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে ১৭ নভেম্বর জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ ৭ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মেছেদা, নোনাকুড়ি, তমলুক, নিমতৌড়ি, ভোগপুর, পাঁশকুড়া, কাঁথি, হলদিয়া সহ বিভিন্ন স্থানে মহান নভেম্বর বিপ্লববার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। নভেম্বর বিপ্লবের রূপকার লেনিন ও স্ট্যালিনের মূর্তিতে মাল্যদান, তাঁদের ছবি সম্বলিত ব্যাজ পরিধান, উদ্ধৃতি প্রদর্শনী, আলোচনা সভা প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়। এই উপলক্ষে মেছেদাতে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে দলের জেলা কমিটির উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মূল বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও জেলা সম্পাদিকা অনুরূপা দাস, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুব্রত দাস প্রমুখ। ৮ নভেম্বর নিমতৌড়ির সভায় বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রদীপ দাস, ৯ নভেম্বর নোনাকুড়িতে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য জীবন দাস প্রমুখ। তাছাড়াও রাজ্যের প্রতিটি জেলায় অসখ্য কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

তীব্র পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে মরক্কোর শ্রমজীবী মানুষ

শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ ও জলের বিল, তেল, আটা, জ্বালানি সহ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ ও সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির দাবিতে ১৭ অক্টোবর আন্তর্জাতিক দারিদ্র দূরীকরণ দিবসে মরক্কো সমাজতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এফএসএম)-এর নেতৃত্বে মরক্কোর ৩০টিরও বেশি শহরে সাধারণ মানুষ ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায়। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমের এই দেশটিতে স্বাধীনতা ও আর্থ-সামাজিক অধিকারগুলি সুরক্ষিত করার দাবিতে ও আকাশছোঁয়া দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে তিন দিনের যে বিক্ষোভ কর্মসূচির আহ্বান জানিয়েছিল এফএসএম, ১৭ তারিখ ছিল তার শেষদিন। বিক্ষোভে সামিল হয়েছিল ওয়ার্কার্স ডেমোক্রেটিক ওয়ে পার্টি (ডব্লিউডিডব্লিউ) এবং ও মরক্কো অ্যাসোসিয়েশন অফ হিউম্যান রাইটস সংগঠন।

আন্দোলনকারীদের এক নেতা মুয়াদ এলজোহরি মন্তব্য করেছেন, মরক্কোর জনসংখ্যার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ আজ অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এই দারিদ্র্য আকাশ থেকে পড়েনি। এ হল শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণনীতির পরিণাম। তিনি আরও বলেছেন, মরক্কোয় দরিদ্র জনসাধারণের সংখ্যা যখন বেড়ে চলেছে, অধিকাংশের ক্রয়ক্ষমতা যখন ভীষণ ভাবে কমছে, ঠিক তখনই, গত দু'বছরে সরকারের বড়কর্তাদের সম্পদ বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে!

রাজধানী রাবাতে পার্লামেন্ট স্কোয়ারের সামনে ১৭ অক্টোবর বিক্ষোভ-অবস্থানের ডাক দিয়েছিল এফএসএম। সেখানে আন্দোলনকারীরা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের লুঠ ও শোষণের নীতিকে ধিক্কার জানিয়ে বলেন, গোটা বিশ্ব জুড়ে সাধারণ মানুষ আজ ঘৃণ্য পুঁজিবাদী শোষণের শিকার। এদিন কাসাব্লাঙ্কা, মারাকেস, টেটুয়ান সহ বিভিন্ন শহরের শান্তিপূর্ণ মিছিলগুলিতে পুলিশ হামলা চালায়।

মূল্যবৃদ্ধি রোধ সহ নানা দাবিতে মরক্কো সংসদের সামনে নাগরিকদের বিক্ষোভ

কৃষিপ্রধান দেশ মরক্কো বর্তমানে ভয়ঙ্কর খরার কবলে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা। খাদ্যপণ্যের দামও কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ায় জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে। ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়ার জন্য জনগণের দাবি অগ্রাহ্য করে মালিকদের মুনাফার স্বার্থে মরক্কো সরকার ডিজেল ও গ্যাসোলিন সহ জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়ে চলেছে।

আন্দোলনে যোগদানকারী সংগঠন ডব্লিউডিডব্লিউ-ও একইভাবে মরক্কোর দরিদ্র জনসাধারণের দুর্দশার পিছনে, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজিমালিকের হাতে দেশের সমস্ত সম্পদ জমা হওয়াকে দায়ী করেছে। সংগঠনটির এক নেতৃস্থানীয় আন্দোলনকারী মন্তব্য করেছেন, নিপীড়িত মানুষ সংগঠিত হয়ে যখন এইসব লুটেরা ও তাদের প্রভুদের কাছ থেকে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারবে, তখনই সমাজ থেকে দারিদ্র্য মুছে ফেলা যাবে।

শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি বৃদ্ধি, জ্বালানি তেল সহ খাদ্যদ্রব্যের দাম কমানোর পাশাপাশি এফএসএম মরক্কোর একমাত্র তেল শোধনাগারটির জাতীয়করণের দাবি তুলেছে। তেল-লবি যে বিপুল অর্থ লুট করেছে, তা জনগণকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিও তুলেছেন আন্দোলনকারীরা। এছাড়াও ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত দমনমূলক আইনগুলি প্রত্যাহার করা, ঠিকা-শ্রম প্রথা বন্ধ করা, সকলের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিনামূল্যে সরকারি পরিষেবা দেওয়া, সকলের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, কাজের অধিকার সুনিশ্চিত করা, জমি-মাফিয়াদের জমি লুট বন্ধ করা এবং বেকারভাতা দেওয়ার দাবি উঠেছে। আন্দোলনকারীরা মরক্কোর সমস্ত রাজনৈতিক বন্দি ও বেআইনি ভাবে কারারুদ্ধ হয়ে থাকা সাংবাদিকদের অবিলম্বে মুক্তির দাবিও তুলেছেন। মরক্কোর মানুষের অভিজ্ঞতা ভারতের শোষিত মানুষের অভিজ্ঞতার থেকে কিছুমাত্র আলাদা নয়। ভারতেও একচেটিয়া পুঁজির তীব্র শোষণে জর্জরিত হচ্ছে সমাজের ৯৯ ভাগ মানুষ।

হিন্দিতে এমবিবিএস
সামগ্রিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করবে চিকিৎসকদের

মধ্যপ্রদেশে এমবিবিএস পাঠক্রমে হিন্দিতে পাঠ্যপুস্তক চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেখানকার বিজেপি সরকার। এর তীব্র নিন্দা করেছেন এআইডিএসও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ। ২১ অক্টোবর এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার এমবিবিএস পাঠক্রমে হিন্দি সহ অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ্যপুস্তক চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মধ্যপ্রদেশ সরকার ইতিমধ্যেই হিন্দিতে এমবিবিএস পাঠ্যপুস্তক ছাপিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে ভোপালে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই পরিকল্পনা কার্যকর করা শুরু করেছে।

এই সিদ্ধান্তের কারণ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ছাত্রদের সুবিধা হবে— এই যুক্তি খাড়া করছে। কিন্তু আমাদের দেশে চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন এবং সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে তা আয়ত্ত করা ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় সম্ভব নয়। কারণ চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমস্ত প্রামাণ্য বই যেগুলি গোটা বিশ্বে চর্চা করা হয় এবং গবেষণা, আবিষ্কার যা চিকিৎসাবিজ্ঞানে হয়েছে, সেগুলির সবই ইংরেজিতে লেখা এবং তার সমস্ত পরিভাষা হয় ইংরেজিতে নয় ল্যাটিন ভাষায়। এমনকি এই সমস্ত বইয়ের হিন্দি বা অন্য কোনও ভাষায় উপযুক্ত ভাবে অনুদিত বইপত্র এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ফলে হিন্দি বা অন্য কোনও আঞ্চলিক ভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়ানো বাস্তবে সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, সরকারের এই পদক্ষেপে স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রদের মধ্যে দুটি শ্রেণি সৃষ্টি হবে। এক শ্রেণির ছাত্রছাত্রী ইংরেজিতে পড়াশোনা করে উচ্চতর শিক্ষায় যেতে পারবে। অপর শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা যারা হিন্দি বা আঞ্চলিক ভাষায় পড়াশোনা করবে, তারা চিকিৎসাবিজ্ঞানের সামগ্রিক জ্ঞান অর্জন করা থেকে বঞ্চিত হবে। বলা বাহুল্য, হিন্দি অথবা আঞ্চলিক ভাষায় এমবিবিএস পাশ করা একজন ছাত্র পরবর্তীকালে শুধু বিদেশেই নয়, এমনকি আমাদের দেশের অন্য রাজ্যেও উচ্চশিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে বহু বাধার সম্মুখীন হবে।

শুধু মেডিকেল শিক্ষাই নয়, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০-তে প্রস্তাব করা হয়েছে, সব আঞ্চলিক ভাষাতেই উচ্চশিক্ষা চালু করতে হবে। বিগত কয়েক দশকে কোনও সরকারই হিন্দি বা অন্য আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে উন্নত করার জন্য কোনও বিজ্ঞানসম্মত উপায় অনুসরণ করেনি। এই অবস্থায় জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০-র প্রস্তাবগুলি কার্যকরী হলে জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াটিই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার এই ক্ষতিকর প্রস্তাবের পাশাপাশি মধ্যপ্রদেশের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী আরও একধাপ এগিয়ে সমস্ত প্রেসক্রিপশনে 'শ্রী হরি' লেখার প্রস্তাব করেছেন। শিক্ষার গৈরিকীকরণের দিকে অগ্রসর হওয়ার এটি আরেকটি পদক্ষেপ মাত্র। দেশের সমস্ত মেডিকেল ছাত্র, ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী সহ সাধারণ মানুষের কাছে তিনি ঐক্যবদ্ধহয়ে এই জনবিরোধী নীতি প্রতিরোধ করার আহ্বান জানান, যাতে চিকিৎসাবিজ্ঞানকে সাম্প্রদায়িক শক্তির সমস্ত আক্রমণ এবং ধূলিসাৎ হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়।

পাঠকের মতামত

শাসকের পরম্পরা

২০ অক্টোবর আন্দোলনকারী টেট চাকরিপ্রার্থীদের উপর তৃণমূল সরকারের পুলিশের যে অত্যাচার হয়েছে তার প্রতিবাদে সমাজের সর্বস্তরেই নিন্দার ঝড় উঠেছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করতে সব সরকারই নানা অজুহাতে পুলিশকে ব্যবহার করে। এই ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার ১৪৪ ধারা ও আদালতের কিছু মন্তব্যকে হাতিয়ার করেছে।

অতীতেও পশ্চিমবঙ্গবাসী এমন ঘটনার সাক্ষী থেকেছে। সারা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলেও এমন অনেক চিত্র দেখা যাবে যেখানে সরকারগুলি গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রতিহত করতে আন্দোলনকারীদের মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করেছে কিংবা নামিয়ে এনেছে নানা নির্যাতন। দিল্লির রাজপথে কৃষি বিল প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনকারী কৃষকদের উপর পুলিশ ও শাসক দল বিজেপি সমর্থকদের অত্যাচারের ঘটনা সবার জানা।

১৯৫৯ সালে রাজ্যে খাদ্য সংকট মোকাবিলার দাবিতে কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে বামপন্থী দলগুলোর নেতৃত্বে তৈরি হয় 'মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি'। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শুরু হয় খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন। এরপর আসে সেই ঐতিহাসিক দিন ৩১ আগস্ট। খাদ্যের দাবি ও পুলিশি দমন-পীড়নের প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষের শান্তিপূর্ণ মিছিলে সরকারের নির্দেশে নেমে আসে নির্মম পুলিশি অত্যাচার। বেপরোয়া লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস চার্জে মৃত্যু হয় ৮০ জনের, আহত শতাধিক। পরের দিন ১ সেপ্টেম্বর মৃত্যুর জবাব চাইতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে হাজার হাজার ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের লাঠি ও গুলিতে মারা যায় ৮ জন, আহত ৭৭ জন। এইসমস্ত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ৩ সেপ্টেম্বর পালিত হয় সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল। ওই দিনও পুলিশ গুলি চালানোয় মারা যায় ১২ জন, আহত হয় ১৭২ জন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এমন নৃশংস পুলিশি আক্রমণের ঘটনা বিরল। সিপিএম সরকারের আমলে নেমে এসেছে আক্রমণ। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৯ সালের ১৫ জুন এসইউসিআই (সি) দলের আইন অমান্যে বর্বর আক্রমণ চালায় পুলিশ। ১৯৮৩-তে এস ইউ সি আই (সি) -র ডাকে বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনে পুলিশ গুলি চালালে কলকাতা ও পুরুলিয়া মিলিয়ে তিনজন শহিদ হন ১৯৯০ সালে এস ইউ সি আই (সি) কর্মী মাধাই হালদার শহিদ হয়েছেন পুলিশের গুলিতে। ২০০৭-এ বিদ্যুৎগ্রাহকদের আন্দোলনে পুলিশের গুলি চলেছে। ২০০৬-এর ২৫ সেপ্টেম্বর টাটার স্বার্থে জোর করে জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে সিঙ্গুর বিডিও অফিসের সামনে কয়েক হাজার কৃষকের অবস্থানে পুলিশের অত্যাচারে ২১ বছরের তরতাজা যুবক রাজকুমার ভুল শহিদ হন। ২০০৭-এর ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামের কৃষকদের উপর পুলিশ গুলি চালায় এবং ১৪ জনের মৃত্যু হয়।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশের ভূমিকা কেমন হবে এ সম্পর্কে কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি প্রভৃতি রাজনৈতিক দল যারা সরকারে গেছে তাদের অবস্থান এক। ব্যতিক্রম এসইউসিআই(সি)। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমমন্ত্রী এই দলের নেতা সুবোধ ব্যানার্জী, শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে ১৯৬৭ সালের মে দিবসে, শহিদ মিনারের সভায় এক ঐতিহাসিক বক্তব্যে বলেন, 'পুলিশকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে যেন দমন না করে।' তাঁর দলের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বামপন্থীরা সরকারে গেলেও পুলিশ দিয়ে আন্দোলনকে দমন করবে না। শুধু তাই নয়, মালিক ও সমাজবিরোধী শক্তির অন্যায় আক্রমণ থেকে এই সব আন্দোলনগুলিকে রক্ষাও তারা করবে। এটাই একটা বুর্জোয়া ব্যবস্থার সেবাদাস সরকার এবং যথার্থ বামপন্থী দলের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য।

যিশু সামন্ত
খানাকুল, হুগলি

৭৫ বছরেও ঘর পেল না কয়েক কোটি ভারতবাসী

খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-স্বাস্থ্য হল মানুষের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার। একটি শিশু জন্মানোর পরেই যেমন তার মুখে খাবার তুলে দিতে হয় তেমনই দিতে হয় বস্ত্র। একই সাথে প্রয়োজন হয় একটা নিশ্চিত আশ্রয়ের। ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী যখন বলেছিলেন 'হর ঘর তিরঙ্গা' তখন এ দেশের অসংখ্য মানুষ চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে পাননি— তাঁর ঘরটা কোথায়!

যখন বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের বিজ্ঞাপনে সংবাদমাধ্যমের প্রথম পাতা ঢেকে যায়, ঠিক তখনই সারা বিশ্বে ১৬০ কোটি মানুষের দিনের শেষে মাথা গুঁজবার বাসস্থানটুকু পর্যন্ত নেই। আর আমাদের দেশ ভারতে? ঠিক কতজন গৃহহীন তার নির্দিষ্ট তথ্য সরকারের কাছে নেই। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে কেন্দ্র বলছে, ভারতে ১৮ লক্ষ মানুষের ঘর নেই। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার দাবি করছে গত দশ বছরে তারা রাজ্যের গৃহহীনদের জন্য ৪৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭১৭ টি বাড়ি তৈরি করেছে এবং আগামী দু'বছরের মধ্যে আরো ৫০ লক্ষ বাড়ি তৈরি করা হবে (আবাপ১৭/০২/২২)। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া এই তথ্য সঠিক, বলাই যায়, এই রাজ্যে এখন ন্যূনতম গৃহহীন মানুষের সংখ্যা আধ কোটি। রাস্তায় পড়ে থাকা মানুষের সংখ্যার বিচারে দেশে এই রাজ্য দ্বিতীয়। তা হলে জনগণনা অনুসারে দেশে গৃহহীন মানুষের যে সংখ্যাটা সরকার দেখায় তার সঙ্গে বাস্তবের বিস্তর অমিল।

এছাড়া সতেরো কোটি মানুষ ঘর বলতে যা বোঝান তা হল প্লাস্টিক, ছেঁড়া ত্রিপল, কাঠকুটো, ভাঙা অ্যাসবেসটাস দিয়ে তৈরি ঝুপড়ি। এটাও সরকারি তথ্য, বাস্তবে সংখ্যাটা যে আরও অনেক বেশি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ-ওয়ান শহর কলকাতায় ৩৩ শতাংশ মানুষ বস্তিবাসী। বস্তির সংখ্যায় মহারাষ্ট্র আর গুজরাটের পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। রাতে একদিন কেউ কলকাতা ভ্রমণ করলে ফুটপাতে পা রাখার জায়গাপাবেন না, সেখানে শুধু মানুষের সারি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কল্যাণে দেশে বৈষম্য যত বাড়ছে ততই একদিকে বাড়ছে আধুনিক ইমারত শৈলী অপরদিকে বাড়ছে বস্তিবাসী ফুটপাতবাসীর সংখ্যা। রাস্তা কিংবা রেললাইনের ধারে, বড় বড় ইমারতের পাশে, খোলা আকাশের নিচে, রাজপথের আন্ডার পাস, ফ্লাইওভার, ব্রিজ, বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন, পার্ক, হাট-বাজার, শপিং মল, শহরের ফুটপাতে কোনওরকম থাকা। বৃষ্টি পড়লে কোনও বাড়ির কার্ণিসের তলায় মাথা গুঁজে রাত কাটানো, শীত পড়লে কোনওরকমে গা গরম করে বেঁচে থাকা, না হয় ঠাণ্ডায় জমে মরে পড়ে থাকা, গরমের দুপুরে গাছের তলা না হলে কোথাও কোনও একটা খাঁজে একটু ছায়া খুঁজে নেওয়া। ছিন্নমূল, গৃহহীন এসব মানুষের করুণ দৃশ্য। দেশের নাগরিক হলেও এরা সংবিধান প্রদত্ত বাঁচার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এদের আশ্রয় নির্মাণ এবং সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট, বিভিন্ন হাইকোর্ট পাতার পর পাতা খরচ করে নানা সময় নানা নির্দেশ দিয়েছে। সেই নির্দেশ পালনের দায় কারও নেই। তাই গৃহহীনদের অবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। পুলিশ ও অপরাধীরা এদের তাড়িয়ে বেড়ায়। এদের ৫১ শতাংশকে গড়ে পাঁচবার পুলিশ উচ্ছেদ করে। এই মানুষদের আশি ভাগ রেশন পর্যন্ত পায় না। এরা সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন। নানাভাবে শোষণের শিকার। গৃহহীনদের ৪৬ শতাংশের বয়স ৩৫ বছরের নিচে। তাদের যথাযথ জীবিকা নেই। শিক্ষালাভ বা পেশাগত যোগ্যতা বাড়ানোর কোনও সুযোগ তারা পায় না। বস্তিবাসীদের অনেকের কাছে বিশুদ্ধপানীয় জল, শৌচাগার এখনও পৌঁছায়নি। আর নোটিফায়েড নয় এমন বস্তিবাসীদের জীবন যন্ত্রণা অবর্ণনীয়।

এতদিন ধারণা ছিল শহরে গৃহহারাদের অধিকাংশই পরিযায়ী। একটি বেসরকারি সংস্থার সমীক্ষা বলছে এই ধারণা ভুল। শহরে প্রতি পাঁচ জন গৃহহীনের তিনজন জন্মেছেন সেখানেই। অর্থাৎ নিজের জন্মের শহরে সারা জীবন কাটিয়েও দরিদ্র প্রান্তবাসী এই মানুষদের মাথার উপর আচ্ছাদন জোটেনি। এরপর ঝুপড়ি বা তার চেয়ে ভালো বস্তিতে থাকা মানুষকে তাড়া করে সর্বদাই উচ্ছেদের আতঙ্ক। কেবল ২০১৮ সালে সরকারি হিসাব বলছে, সারা বছরে ২৯ লক্ষ মানুষকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। কখনও রাস্তা, কখনও এয়ারপোর্টের নামে বা অন্য কিছু উন্নয়নের কথা বলে। ২০১৭-র সরকারি হিসাবে ৫৩ হাজার ৭০০ বাড়ি-ঝুপড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। মাথার উপর ছাদের যোগান দিতে পারুক বা না পারুক বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র বিকাশ আর উন্নয়নের স্লোগান তুলে মাটিতে গুঁড়িয়ে দেয় মানুষের মাথার উপর সামান্য ভাঙা ছাদও।

'রোটি কাপড়া আউর মকান' এই স্লোগান সেই '৪৭ সাল থেকে দিচ্ছে দলগুলি। প্রতিটি নির্বাচনের আগে সব রাজত্বে, সব জমানায় গৃহহীনদের আবাসন এক জনমোহিনী স্লোগান। কিন্তু মাথার উপর ছাদের স্বপ্ন! বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ২০১৫-তে বলেছিলেন ২০২২ এর মধ্যে সবার মাথার উপর ছাদ হবে। সেই বাড়িতে জল থাকবে, থাকবে বিদ্যুৎ ও শৌচালয়। বলেছিলেন, এইভাবে আমরা স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উৎসব উদযাপন করব। এখন বলছেন ২০৪৫ সালে হবে। এরপর ২০৪৫ এ অন্য কেউ বলবেন ২০৬৫ তে হবে। এ ভাবেই পুঁজিবাদী ভারতে মানুষের মাথার উপর ছাদ, একটু ছোট্ট ঘরের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়।

কিন্তু এটাই কি সম্পূর্ণ ভারতের চিত্র, মোটেই তা নয়। আরও এক ভারত আছে যে প্রতিদিন ফুলে ফেঁপে উঠছে। এমনকি করোনা পরিস্থিতিতেও। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সমীক্ষা বলছে কোভিড কালে ভারতে ধনীরা আরও ধনী হয়েছে, গরিবরা আরও গরিব। সেই ধনী ভারতের ছবিটা এক্ষেত্রে ঠিক কেমন একটু দেখে নেওয়া যাক। ভারতের মতো একটা দেশে যেখানে কোটি কোটি মানুষের বাড়ি হল একটা তামাশা, সেই দেশেই মুম্বাইয়ের পেডার রোডের একটা বাড়ি যার নাম অ্যান্টিলা, তৈরির খরচ ১৫ হাজার কোটি টাকা। সেই বাড়িতে একটা হেলিপ্যাড আছে। ৫০ জন বসে দেখার মতো সিনেমা হল আছে। ১৬৮টি গাড়ি রাখার গ্যারেজ আছে, আর আছে অসংখ্য ঘর। এ ছাড়াও বড় বড় শিল্পপতি, ফিল্ম স্টার, নামী ক্রিকেটারদের কারও বাড়ি ৭৫০ কোটি টাকার কেউ বা সাড়ে চারশো কোটি থেকে দুশো কোটি টাকার বাড়িতে বাস করেন। কোনও কোনও নামকরা রাজনৈতিক নেতার বিশাল তথাকথিত 'কুটির' দেখেও মাথা ঘুরে যাওয়ার কথা এদেশের মানুষের জানা আছে। এ রকম অনেক আছে শত শত কোটি টাকার বাড়ি এবং তা হল দেশের এক শতাংশ মানুষের। এদের গৃহপালিতদেরও আলাদা ঘর আছে। সেই ঘরের সঙ্গে অন্য ভারতের মানুষের ঘরের তুলনাও করা যাবে না। ছেঁড়াফাটা জামাকাপড় সহ অল্প যা কিছু সম্বল আঁকড়ে নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে অন্তহীন পথ চলা সেই অসহায় মানুষগুলি পথের বাঁকে হঠাৎ কোনও জনসভায় শোনে কোনও নেতা বা নেত্রী বলছেন তার ঘরের কথা, স্বপ্ন দেখাচ্ছেন মাথার উপর ছাদের। পেটে ভাত নাই থাক, চাকরি নাই জুটুক সেই মিথ্যা স্বপ্নকে সফল করার ভাবনায় সে আবার ছুটবে ভোটকেন্দ্রের দিকে।

এইভাবেই দিন আসবে দিন যাবে স্বপ্ন স্বপ্নই থাকবে। এইসব অপূরিত স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা না করে আসুন আমরা বরং প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর ছাড়া চিতাদের নিয়ে আলোচনা করি। রিমঝিম বৃষ্টিকে মাথায় নিয়ে শারদ উৎসবের কত ভিড় হল এর হিসাবে যখন উচ্ছ্বসিত টিভির অ্যাঙ্কররা ঠিক সেই সময় সেলিম আর তার বউ নুরজাহান মেয়েকে কোলে নিয়ে একটা বাড়ির কার্নিশের নিচে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি থেকে বাঁচার চেষ্টা করছিল, ক্যামেরা ওদের দেখে না। সন্ধ্যায় পূজার মণ্ডপে দাঁড়িয়ে লেজার শো নিয়ে তরজা চলছে, বাজছে 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা', শো দেখাচ্ছে এ দেশ এখন অমৃত কালের পথে। তখন তার থেকে কিছুটা দূরে কোলে মার্কেটের কাছে কল্যাণ আর তার স্ত্রী মিনতি একটা বড় প্লাস্টিকের নিচে তাদের দুই সন্তানকে নিয়ে ভাবছে ফুটফুটে দুই অমৃতের পুত্রকে তারা বৃষ্টি থেকে বাঁচাবে কী করে?

বিশ্বকাপের স্টেডিয়ামে লেগে আছে ভারতীয় শ্রমিকদের রক্তের দাগ

এবার ফুটবল বিশ্বকাপের আসর বসতে চলেছে কাতারে। নতুন স্টেডিয়াম বানাতে খরচ হয়েছে ছশো কোটির কিছু বেশি। চালকবিহীন অত্যাধুনিক মেট্রো ব্যবস্থার জন্য ছত্রিশশো কোটি। এয়ারপোর্ট থেকে দোহা শহর পর্যন্ত হাইওয়ে ঝলমল করছে সদ্য বসানো স্ট্রিট লাইটের আলোয়। সব মিলিয়ে ফুটবল বিশ্বকাপ-২০২২ এর বাজেট তিরিশ হাজার কোটি টাকা। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ফিফার কর্তা এবং কাতারের আয়োজকরা এক সুরে বলছেন, বিশ্বকাপের ইতিহাসে এমন বিরাট কর্মকাণ্ড আগে কখনও হয়নি। কাতারে এই 'অভূতপূর্ব' বিশ্বকাপ যেদিন শুরু হবে, তার ঠিক এক বছর আগে, গত বছরের নভেম্বরে, দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানার গ্রামে বসে লতা বোল্লাপল্লী একটা ফোন পেলেন। অত্যন্ত নিরুত্তাপ গলায় তাঁকে জানানো হল, তাঁর স্বামী মধু হার্টফেল করে মারা গেছেন। ক'দিন পর মধুর কফিন-বন্দি দেহ এল, সাথে পাওনা মাইনের যৎসামান্য টাকা, যা দিয়ে আজকের দিনে দু'মাসও সংসার চলে না। বছর চল্লিশের মধু কাতার গিয়েছিলেন বিশ্বকাপের নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে, যেমন গিয়েছিলেন অখিলেশ, রমেশ, জগন, পদ্মশেখর, আব্দুল মজিদের মতো অনেকেই। কেউ কলমিস্ত্রী, কেউ ডেলিভারি শ্রমিক, কেউ নির্মাণ শ্রমিক হয়ে দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করছিলেন। ওরা ফিরলেন না, কফিনে মোড়া দেহগুলো ফিরল বিহার, পাঞ্জাব, তেলেঙ্গানার গ্রামে। অতিমারির কল্যাণে 'পরিযায়ী শ্রমিক' শব্দটার সাথে পরিচয় ঘটেছিল অনেকেরই। দেশজুড়ে হঠাৎ ঘোষিত লকডাউনের অচলাবস্থার মধ্যে তাঁদের অসহায়তার ছবি উঠে এসেছিল সংবাদপত্রের শিরোনামে। মাইলের পর মাইল হেঁটে বাড়ি ফিরতে গিয়ে পথশ্রমে, অসুস্থতায়, অনাহারে, পথ দুর্ঘটনায় অসংখ্য শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন সেই সময়। আরও কতজন কাজ হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, দেশের বেকারত্ব আর দারিদ্রের ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ দেখলে তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়। কেউ আগেই, কেউ অতিমারির ধাক্কা সামলে উঠতে একটু ভালো রোজগারের আশায় বুক বেঁধে অজানা অচেনা দেশে গিয়েছিলেন। ২০১০-এ কাতার বিশ্বকাপের ঘোষণার পর থেকে এই বিপুল কর্মকাণ্ডের জন্য সেখানে শ্রমিকের চাহিদাও বেড়েছে। লোকসভার রেকর্ড অনুযায়ী, গত তিন বছরেই ভারত থেকে কাতারে গেছেন এমন শ্রমিকের সংখ্যা ৭২ হাজার ১১৪।

বাইশ বছরের অখিলেশ কুমার গিয়েছিলেন বিহার থেকে। কোনও একটি স্টেডিয়ামের কাছে মাটির তলায় জলের পাইপ ঠিক করার সময় মাটি ধসে মৃত্যু হয়েছে অখিলেশ এবং তাঁর বত্রিশ বছরের সহকর্মী জগনের। এই মর্মান্তিক মৃত্যুর থেকেও ভয়ানক মালিকদের ঔদাসীন্য। কোনও ক্ষতিপূরণ পাওয়া তো দূরের কথা, মৃত মানুষগুলোর বাড়িতে একটা খবর দেওয়ারও প্রয়োজনও তারা মনে করেননি। অখিলেশের স্ত্রী গ্রামে বসে স্বামীর মৃত্যুসংবাদও পেয়েছেন অন্য এক পরিচিত বন্ধুর মারফত। গ্রামে একটা বাড়ি করার স্বপ্ন ছিল তেলেঙ্গানার রমেশের। অর্ধেক তৈরি হওয়া বাড়িটা পুরো করবেন বলে টাকা ধার করে গিয়েছিলেন কাতারে। রাস্তা বানানোর কাজ করছিলেন, বিশ্বকাপ স্টেডিয়ামে যাওয়ার ঝকঝকে রাস্তা। শ্রমিকদের ক্যাম্পে একটা দমবন্ধ করা একচিলতে ঘরে পাঁচজন গাদাগাদি করে থাকা, পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মারাত্মক দাবদাহে, প্রচণ্ড ধুলোর মধ্যে সারাদিনের অমানুষিক পরিশ্রম। রমেশের শরীর এই ধকল নিতে পারেনি, তাঁর মৃত্যুর পর কোম্পানি শুধু সে মাসের মাইনেটা দিয়ে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। ষাট হাজার আসনের যে চোখধাঁধানো আল-বেইট স্টেডিয়াম কাতার বিশ্বকাপের অন্যতম আকর্ষণ, সেখানে টানেল বানাতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন জলেশ্বর প্রসাদ, দু ঘন্টা পরে মৃত্যু। কোনও ময়নাতদন্ত ছাড়াই তাঁর নামে লেখা হয়ে গেছে ২০১৬ থেকেই 'শ্বাসের সমস্যা এবং হার্ট ফেলিওর'। কর্তৃপক্ষের রিপোর্টে একটা সংখ্যা হয়ে থেকে গেছেন জলেশ্বর।

কী ভাবে কোন অবস্থায় এই শ্রমিকরা মারা যাচ্ছেন, পেটের ভাত জোটাতে কতটা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁদের কাজ করতে হচ্ছে, এ সব প্রশ্ন যাতে উঠতেই না পারে তার জন্য কর্তাব্যক্তিরা এই সহজ রাস্তা নিয়েছেন। পোস্টমর্টেম, তদন্ত কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে এইসব মৃত্যুর গায়ে 'স্বাভাবিক মৃত্যু' বা হার্ট অ্যাটাকের তকমা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হঠাৎ করে এতগুলো মানুষের এমন অস্বাভাবিক 'স্বাভাবিক মৃত্যু' ঘটছে কেন, তার কোনও সদুত্তর নেই। এমনকী বিশ্বকাপের কাজ করতে গিয়ে চল্লিশ জন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর যে তথ্য আয়োজনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার রিপোর্টেই এসেছে, তাকেও অনায়াসে অস্বীকার করে ফিফার প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, কাজ করতে গিয়ে এরকম মৃত্যু ঘটেছে মাত্র তিনজনের। বাকি সাঁইত্রিশটা তরতাজা প্রাণ তা হলে শেষ হয়ে গেল কী ভাবে? যারা এইসব শ্রমিকদের নিয়োগ করেছিলেন, যাদের কর্মচারী হয়ে এঁরা উদয়াস্ত খাটছিলেন তাঁদের কি কোনও দায়িত্বই ছিল না এই মানুষগুলোর প্রতি, তাদের পরিবারের প্রতি? এ সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায় নেই বিশ্বসেরা বিশ্বকাপের ব্যস্ত আয়োজকদের।

সংবাদপত্র, মানবাধিকার সংগঠনের বেশিরভাগ চিঠি, মেইল-এর কোনও সন্তোষজনক উত্তর আসেনি। দোহার ভারতীয় দূতাবাসও 'এ সংক্রান্ত তথ্য নেই' বলে দিয়ে দায় সেরেছে। দেশের মাটিতেই যে সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের সাথে অমানবিক আচরণ করেছে, তাদের ন্যূনতম সুরক্ষার দায়িত্ব নেয়নি, সেই ভারত সরকার কাতারের মাটিতে এই ভারতীয় শ্রমিকদের মৃত্যু নিয়ে কিছু করবে, এমন আশা করাই বাহুল্য। পুঁজিবাদী অর্থনীতির মুনাফাকেন্দ্রিক চরিত্র বোঝাতে মার্ক্স বলেছিলেন, মালিক শ্রমিককে ততটুকুই মজুরি বা নিরাপত্তা দেয় যতটুকু দিলে সে খেয়ে-পরে বেঁচে থেকে মালিকের মুনাফা ওঠানোর কাজটুকু করতে পারে। আজকের মুমূর্ষু সংকটাপন্ন পুঁজিবাদ আরও ভয়ঙ্কর। শ্রমিককে বাঁচিয়ে রাখার দায়ও আজ মালিকের নেই, একজন শ্রমিক মারা গেলে হাজার হাজার কর্মহীন শ্রমিক অপেক্ষমান। তাই ফুটবল-বিনোদনের প্যাকেজের দাম তিরিশ হাজার কোটি, শ্রমিকের জীবনের দাম কানাকড়িও নয়। কাতার হোক বা ভারতবর্ষ বা আমেরিকা, নিষ্ঠুর শোষণের ছবিটা কমবেশি একইরকম। অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত শ্রমিকের অধিকার, শ্রম আইন এসবও আজ কথার কথা, মালিকের স্বার্থে আইনকেও এ সমাজে দিব্যি পাল্টে নেওয়া যায়।

২০ নভেম্বর বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হবে, দুনিয়া জুড়ে লক্ষ কোটি ফুটবলপ্রেমী টিভির পর্দায়, অনেকে কাতারের নবনির্মিত স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখবেন, দর্শকদের প্রবল উচ্ছ্বাস-উল্লাসে ফেটে পড়বে মাঠ। আর তেলেঙ্গানার কোনও অখ্যাত গ্রামে বসে বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে লতার চোখ ভিজে উঠবে স্বামীর হাসিমুখ মনে করে। আধখানা হওয়া বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে বাবার কথা মনে করে রমেশের ছেলে শ্রবণের বুক ভেঙে উঠে আসবে দীর্ঘশ্বাস, জগনের বাবা কান্না চেপে জোয়ান ছেলের শেষবার দেখা মুখটার কথা জোর করে ভুলে যেতে চাইবেন। বিশ্বকাপের জৌলুসে যেন ভুলে না যাই সেই দধিচিদের কথা, যাদের হাড় দিয়ে তৈরি হয় এই তথাকথিত সভ্যতার ইমারত। ওদের রক্ত মাখানো আছে শুধু স্টেডিয়ামগুলোতে নয়, গোটা পুঁজিবাদী সমাজটার গায়েই তো এই শ্রমিকের রক্তের দাগ। তাই সে সমাজের স্বপ্ন যেন দেখতে পারি— যেখানে মানব সভ্যতার অনন্য সৃষ্টি শিল্প-সুষমামণ্ডিত খেলা ফুটবলে কোনও মানুষের চোখের জল লেগে থাকবে না।

সমাজতন্ত্রে নাগরিক জীবন

তিনের পাতার পর

কর্মক্ষমতা ও প্রতিরক্ষা ক্ষমতা অর্জনের ব্যাজ দেওয়া হত, ব্যাজ পাওয়াকে বিশেষ সম্মানের বলে মনে করা হত। কমসোমল সংগঠনের সব সদস্যই শরীর এবং মনের দিক থেকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে এটাই অভিপ্রেত ছিল।

পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা বলেন, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নে নাকি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রবল টানাটানি ছিল, দোকানে লাইন দিয়েও দরকারি জিনিস পাওয়া যেত না। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সংশোধনবাদী নেতৃত্বের পরিচালনায় যে কুফলগুলি দেখা দিয়েছিল তার দায় তারা সমাজতন্ত্রের ঘাড়ে চাপায়। অথচ, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল, জোর দেওয়া হয়েছিল অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ওপর। তৎকালীন ছবি দিয়ে ক্রাসনভ দেখিয়েছেন, সে সময়েই সোভিয়েট ইউনিয়নে আধুনিক পোশাক পাওয়া যেত, নাগরিকদের জন্য ছিল গ্রামোফোন। ক্রাসনভ তার ছবি দিয়েছেন। উৎসাহী পাঠক ওয়েবসাইটে নর্থস্টার কম্পাস পত্রিকার আর্কাইভ থেকে ২০০৯ সালের জুন ও জুলাই-আগস্ট সংখ্যায় সব ছবি দেখতে পারেন। পুরনো রুশ সিনেমাতেও এসবের প্রমাণ আছে। ক্রাসনভ লিখেছেন, সে দেশে সকলেই একটা সাইকেল কেনার মতো আর্থিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল অথচ একই সময়ে উন্নত পশ্চিমী দেশগুলিতে সকলে একটা করে সাইকেল কিনতে পারত না, টাকার অভাবে। ১৯৩৯ সাল থেকেই সোভিয়েট ইউনিয়নে জীবনযাত্রার মানোন্নতি ঘটতে থাকে। ১৯৪১ সালের ২২ জুন জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনী রাশিয়া আক্রমণ করে। যুদ্ধ তাদের জীবনকে তছনছ করে দিয়ে যায়। কিন্তু দুনিয়াকে অবাক করে দিয়ে অল্প কয়েক বছরেই ঐ ধ্বংসস্তূপ থেকেই আবার দাঁড়ায় উন্নত সোভিয়েট সমাজতন্ত্র।

সমাজতন্ত্রবিরোধীরা সমাজতন্ত্রকে ব্যঙ্গ করে বলে থাকেন তারা নাকি টুথপেস্টের টিউবে স্পেস রিসার্চ করত। অর্থাৎ, টিউবের মধ্যে বেশিরভাগ অংশই কেবল হাওয়া ভরা। অথচ, বিশ্বের ভয়াবহতম যুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন যুদ্ধ শেষের ষোল বছরের মধ্যে ১৯৬১ সালে বিশ্বে প্রথম মানুষকে মহাশূন্যে পাঠায়। রুশ যুবকদের চোখে তখন নভোশ্চর হওয়ার স্বপ্ন। পুঁজিবাদী দেশে ছাত্রদের বলা হয়, শিক্ষাকর্তারা যেমন বলছেন, তা হুবহু নকল করে দক্ষতা অর্জন করো। আর রাশিয়ায় ছাত্রদের শেখানো হত চিন্তা করতে, অধীত বিদ্যাকে কাজে প্রয়োগ করতে। সোভিয়েট ইউনিয়নের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল দুনিয়ার সেরা এবং সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত, তেমনি স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তৈরি স্যানাটোরিয়াম ও রিসর্ট ছিল ফ্রি। শিশুদের জন্য কিন্ডারগার্টেনগুলি ছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ। ক্রাসনভের দেওয়া ছবিতে শিশু-কিশোরদের চোখমুখ দেখলে বোঝা যায় সুস্বাস্থ্য ও রুচিশীলতায় ভরা ছিল তাদের জীবন।

সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তে ভেঙে পড়ার আগে সমাজতন্ত্র মাত্র সত্তর বছরে মানবসভ্যতাকে যা দিয়েছিল চারশো বছরে পুঁজিবাদ যে তা দিতে পারেনি, তা বিদ্বেষমুক্ত মন নিয়ে দেখলে যে কেউই দেখতে পাবেন। কিন্তু উচ্ছেদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত পুঁজিবাদী প্রচার মানুষকে চোখ থাকতে অন্ধ করে রাখে।

বারাসাতে সরকারি কর্মচারীদের কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে ৮ নভেম্বর উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতে অবসরপ্রাপ্ত এবং স্থায়ী কর্মচারীদের হেলথ স্কিম নিয়ে একটি কর্মশালা আয়োজিত হয়। উপস্থিত সদস্যদের হেলথ স্কিম বিষয়ক প্রশ্নের ভিত্তিতে আলোচনা হয়।

কর্মশালাটি পরিচালনা করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সন্তোষ মহন্ত এবং ইউনিয়নের শুভাকাঙ্খী খালেক শেখ। সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন পেনশনার্স ইউনিট গঠিত হয়। শ্যামল দত্ত ও দেবাশীষ ব্যানার্জী যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের প্রবীণ সদস্য মধুসূদন ধর।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে এগরায় বিক্ষোভ

১ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-র এগরা লোকাল কমিটির উদ্যোগে এগরা-১ ব্লকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সাননিহারী পিচরাস্তা থেকে বড়নিহারী পর্যন্ত দুটি ব্লকের সংযোগকারী রাস্তাটির সংস্কার, সমস্ত গ্রামীণ রাস্তা মেরামত, জলনিকাশি ব্যবস্থার সংস্কার, মোড়ে মোড়ে মদের ঠেক বন্ধ করা এবং দুবদা বেসিন এলাকার স্থায়ী বন্যা প্রতিরোধের দাবিতে দু'ঘণ্টা রাস্তা অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। বিডিও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে দাবিপত্র দেওয়া হয়। বিডিও এবং সভাপতি রাস্তাগুলি দ্রুত মেরামতের আশ্বাস দেন।

আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড চিন্ময় ঘোড়াই, কৃষক নেতা জগদীশ সাউ প্রমুখ। বিক্ষোভ অবস্থানে দুই শতাধিক মানুষ অংশ নেন।

সরকারি বাস পরিষেবা বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

সরকারি বাস বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল সরকার। এর তীব্র প্রতিবাদ করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৮ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, একসময় জনসাধারণের আন্দোলনের চাপে পশ্চিমবাংলায় বিধান রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময়ে সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। বিগত সিপিএম সরকারের আমলে অতি কৌশলে ধীরে ধীরে সরকারি বাস কমিয়ে বেসরকারি বাস চালু করা হয় এবং ট্রাম পরিষেবাকে বাস্তবে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করা হয়।

বর্তমানে ট্রাম পরিষেবা প্রায় বিলুপ্ত। সরকারি বাসের পরিষেবা যতটুকু আছে, তাকেও বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে তৃণমূল সরকার। এর ফলে জনগণের ট্যাক্সের টাকায় কেনা বাস বিনামূল্যে বেসরকারি বাসমালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, তাঁদের যেমন খুশি ভাড়া বাড়ানোর অধিকার দেওয়া হবে এবং সরকারি পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য কর্মীকে ছাঁটাই করা হবে। আমরা রাজ্য সরকারের এই জনস্বার্থ বিরোধী পরিকল্পনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং জনসাধারণকে এর বিরুদ্ধেপ্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

মেডিকেল কলেজে টিএমসিপি-র তোলাবাজি
প্রতিবাদ এআইডিএসও-র

সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ সহ রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তোলাবাজি ও সন্ত্রাস, টেট-উত্তীর্ণ আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে ১২-১৩ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে ধিক্কার দিবস পালন করল এআইডিএসও। ছবিতে কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে সংগঠনের প্রতিবাদ মিছিল।

মেট্রো রেলে ছাত্র কনসেশন স্থগিত কি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে

কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ খাতা-কলমে ছাত্র কনসেশন চালু রাখলেও গত দু'মাস ধরে বহু ছাত্র তা না পাওয়ার অভিযোগ করছেন। তাঁদের আশঙ্কা, কর্তৃপক্ষ হয়ত এই সুবিধা বন্ধকরে দিতে চলেছে। সেক্ষেত্রে গরিব, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হবে। এমনিতেই কেন্দ্রীয় সরকার রেল সহ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণ করার পাশাপাশি গরিব, নিম্নবিত্তদের জন্য যে সামান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা ছিল, সেগুলি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে এসইউসিআই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১০ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, দেশে যখন চরম আর্থিক সংকট চলছে, জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য, চরম বেকারি, তখন শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের এই সুবিধা যাতে বন্ধনা হয় কর্তৃপক্ষকে তা নিশ্চিত করতে হবে। উল্লেখ্য, দিল্লি সহ অন্যান্য রাজ্যে সরকারি পরিবহণে ছাত্রদের এবং দিল্লিতে মহিলাদের ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আমরা কলকাতাতেও সেই সমস্ত ছাড় চালুর দাবি করছি।

আদিবাসী, বনবাসী ও সমস্ত গরিব মানুষের অধিকারের দাবি

'অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা' কমিটির আহ্বানে আদিবাসী, চিরাচরিত বনবাসী ও গরিব শোষিত মানুষের প্রথম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কলকাতার ঐতিহাসিক 'ভারত সভা' হলে ৬ নভেম্বর। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিদের সমাগমে ভারত সভা হল কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। সর্বপ্রথমে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন অধ্যাপিকা কবিতা হাঁসদা এবং তারপর এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সম্মেলনে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন পরিমল হাঁসদা, আন্দোলন সংক্রান্ত প্রস্তাব উপস্থাপন করেন পরেশ বেরা এবং সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন চিত্তরঞ্জন মাঝি। এই প্রস্তাবগুলির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ। সম্মেলন থেকে উপরোক্ত তিনটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

মঞ্চে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ

সম্মেলন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন 'অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা' কমিটির সর্বভারতীয় উপদেষ্টা স্বপন ঘোষ, বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ ডঃ সুহৃদ কুমার ভৌমিক, সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক বিসম্বর মুড়া ও দীপক কুমার, সমাজসেবী ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মীরাতুন নাহার এবং অধ্যাপক বুদ্ধদেব ওঁরাও। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন পূর্ণচন্দ্র সরেন। মূল প্রস্তাবের উপর আলোচনায় বিভিন্ন বক্তা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতি তথা আদিবাসী, চিরাচরিত বনবাসী ও গরিব মানুষের উপর নির্মম শোষণ ও চরম বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন এবং তীব্র প্রতিরোধ করার আহ্বান জানান।

ভারত সভা হলে উপস্থিত প্রতিনিধিরা

সম্মেলনের দাবি—আদিবাসী ও চিরাচরিত বনবাসীদের স্বাভাবিক বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না। জঙ্গল এলাকার জমির পাট্টার আবেদনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া চলবে না। বহু পুরুষ ধরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের সহজে বনবাসী হিসাবে সার্টিফিকেট দিতে হবে। সম্মেলন থেকে পরিমল হাঁসদাকে সভাপতি এবং পরেশ বেরা ও অধ্যাপিকা কবিতা হাঁসদাকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৫১ জনের শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির নেতৃত্বে জেলায় জেলায় আন্দোলন এবং আগামী ৩-৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পুরুলিয়া শহরে আহুত সর্বভারতীয় সম্মেলনের ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com